রকম যে আসন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছি ৮৪ লক্ষ আসন আছে, ইহা সত্য। ইহা ছাড়াও আছে। সবই ত অনন্ত।

উভয় চক্ষু-তারার দৃষ্টি এক লক্ষ্যে ভ্রমধ্যে নাসিকাগ্রে বা নিম্ন দিকে নিবদ্ধ থাকিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। কখনও—ঊর্ধবাহু হইয়া একলক্ষ্যে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলাদি দ্বারা মুদ্রার মত নানা প্রকার ক্রিয়াদি হইত। শরীর ও মুখ স্থির রাখিয়া এক দৃষ্টিই মোটামুটি পাঁচ রকম হইত। তাহা ছাড়াও আরও নানা রকম হইত। ঊর্ধদৃষ্টি, অধোদৃষ্টি, সমদৃষ্টি আর দুই চোখে দুই দিকে টেরাদৃষ্টি। এক এক রকম দৃষ্টিতে বহু সময় কাটিয়া যাইত। দৃষ্টি ও আসন একেবারে স্থির ও অটল থাকিত। আবার যে স্থানে দৃষ্টি স্থির হইত ধীরে ধীরে তাহা চক্ষুগোলকে ফিরিয়া আসিত। অর্থাৎ দৃষ্টির মূল যেখানে, সেখানে ফিরিয়া আসা। যেখান হইতে আসা, সেখানেই আসা; যেখান হইতে যাওয়া, সেখানেই যাওয়া — নিজেকে পাওয়ার ক্রম। এ ধারাটা এইরূপও থাকিত — কখনও শূন্যে সমান লাইনে আসিত; কখনও ঊর্ধ এবং অধঃ বা পাশ কাটিয়া চক্ষুগোলকে আসিত। সে এক অদ্ভুত। কোনও সময় বস্তুর উপর দিয়া অর্থাৎ যেমন ঘরের ছাদ, দেওয়াল, মেঝে, কিন্তু ইহা বাদে স্পষ্ট শূন্যের মধ্যে যে ক্রিয়া — ছাদ, দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদির কোন কিছুর ছোঁওয়া নাই, শুধু শূন্যে বিবিধ প্রকারের ক্রিয়া — ইহাও অনন্ত। শূন্যেতে যেমন নিজমূর্তি দর্শন, কি অন্যান্য মূর্তি দর্শন, সেখানেই নিজেতে দৃষ্টি ও অন্তর্ধান — ইহাও তো কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, সেইটি যেমন হইত।

১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে ভোলানাথ স্বপ্ন দেখিল যে তাঁহার মা, বাবা ও ইষ্টদেবী আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। ১৫ই তারিখে ভোলানাথ আমাকে এই সব কথা বলে। ঐ দিন ভোলানাথ খুব ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি না সারিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাছারি চলিয়া গেল। এ শরীর নিত্য আসনে বসিবার মত বসিলে খুব জোরে জোরে স্তব স্তোত্রাদি হইতে লাগিল। হঠাৎ কি জানি কেন খেয়াল হইল — কাছারি হইতে ভোলানাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য চাকরকে বলা হইল। দুইবার ডাকাতেও যখন আসিল না, তখন খবর দেওয়া হইল — যদি তুমি না আস, তবে এ শরীর নিজেই আসিবে। ইহা শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে

বাড়ী আসিলেন। আসামাত্রই বলা হইল — তুমি স্নান করিয়া আস। স্নান করিয়া আসিলে একটি মন্ত্র আপনি প্রকাশ হইল। জপের ক্রিয়াদি বুঝাইয়া তাহাকে বলাটাও কেমন করিয়া হইয়া গেল। যেমন আসন, মুদ্রা, যোগের ক্রিয়াদি আপনা হইতেই হইয়া যাইত, ভোলানাথের সম্বন্ধেও এইসব আপনা হইতেই এইরূপ হইয়া গেল। তোমরা বল না যে — গুরুর উপদেশ, জ্ঞানের প্রকাশ। মহাবাক্য — সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ — সে দিকটা ধর না। সব কথাগুলি সেই ভাবের প্রকাশ। কারণ নিজেতেই নিজে কিনা। নিজেই গুরু নিজেই শিষ্য। আগাগোড়া শরীরটা এইভাবে খেলিয়া আসিতেছে, দেখিতেছিস্ ত — যখন যেখানে, তদ্রূপ হইয়া। এই সব কথাগুলিই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ, যেখানে যেমন।

সাধনার খেলার বিভিন্ন দিক

পৌষ মাসের প্রথম কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন দুপুর বেলা আসনে বসিয়া আছি, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যাস্তের কিছু বাকি। এই দুই — একে অপরকে বলিতেছে। প্রথমতঃ কেমন একভাবে সংস্কৃত ভাষায় কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইল। পরে বাংলায় অন্যভাবে মুখের ভিতর হইতে ঐ কথা প্রকাশ পাইল। তখন জিজ্ঞাসা করিবার খেয়াল আসিল — তবে দ্বিতীয় কে? আপনা হইতে উত্তর হইল — স্বয়ং আপনিই। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বলিলে যেমন সমগ্রের নিঃসংশয় প্রকাশ, তেমনই! দুই এক — এক-ই, ভিতরে বাহিরে এক হইয়া কি এক মহান প্রকাশের পরিচায়ক ঐ। ঐ সময় — সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে — সেই যে ব্যক্ত অব্যক্তে, নিত্য সত্য শাশ্বত — তোরা যা বলিস না — তাই তন্মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ। ভাষায় প্রকাশ হয় না, নিছক। সেই প্রকাশটা কি রকম যে তাহা তো ভাষায় আসেই না। ইহাতে বুঝিবে যে এক লক্ষ্যে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী সাধনা করিতে করিতে সাধক যখন সাধনার সমাধানে উপস্থিত হয়, তখন তাহারও এক প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যা নিত্য — ইহাও হইতে পারে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরিচয়টাও ত উহার ভিতরে। এ শরীরটার গতির ভিতরে কি রকম এক স্থির, ধীর, গম্ভীর, নিশ্চল অর্থাৎ অচঞ্চল ভাব

আসিয়া সমস্তটা কেমন হইয়া গেল। আর এই শরীরের মুখ দিয়া তখন বাহির হইতেছিল — আজ হইতে সাধারণভাবে সকলের সাথে কথা বলা হইবে না। বিশেষ দরকার হইলে কেবল ভোলানাথের কাছে কথা বাহির হইবে। কর্মাদির জন্য যতটুকু, ততটুকুই। আজ রাত্রে বিছানায় সামান্য গড়ানোটুকুও হইবে না। তিনদিন উপবাস থাকা হইবে।

আরও কথা হইয়াছিল যে এই শরীরের নমস্কার নিবার কেহ নাই। উপস্থিত বহিঃপ্রকাশে কেবল ভোলানাথকে নমস্কার করা, যেমন হইয়া আসিতেছিল। যেমন বীজ, মন্ত্র, স্তোত্র, ক্রিয়াদি ভিতর হইতেই পূর্বে পূর্বে বাহির হইতেছিল সেইভাবেই উপরোক্ত কথাগুলি বাহির হইয়াছিল এবং আরও অনেক কিছু প্রকাশ হইয়াছিল।

এখানে মাকে প্রণামের কথা জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন — যেখান হইতে সৃষ্টি অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকাশ হইতেছে — অবতার, মহাপুরুষ, যোগী, সাধক, দেব, মানব, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, ক্ষুদ্র পিপীলিকাটি পর্যন্ত — যা মূল প্রকাশ, ক্রিয়া অক্রিয়া, কৃপা অকৃপা — এখানে প্রণম্য কে? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা — এটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশটা আর কি।

আর সৃষ্টি হইতেছে, সেটা কার, কে? — সে-ই। লীলা খেলাটা কি? — সে-ই। আলাদা আলাদা যে দেখিতেছ — সে-ই। না দেখাটাও — সেই-ই। পাওয়া না পাওয়া, আনন্দ নিরানন্দ — সে-ই। আবার এইরূপেও তিনি, ঐরূপেও তিনি। আবার একমাত্র স্বয়ংই — যা-তা।

ইহাতে কে কাহাকে প্রণাম করিবে? এই বিকাশের পর আর তো প্রণম্য থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার পর যখন আবার হইল — গাছের ঝরা ফল কুড়াইয়া খাওয়া হইবে, ঋষিদের ভাবে থাকা হইবে, তিন গ্রাস বা তিন দানার বেশী না খাওয়া, ইহা কি করিয়া আসিতে পারে? পূর্বের এ ভাবটা নিজেই নিজেতে একটু আড়াল দিয়া চলা। ঐ আড়াল দেওয়া এবং আড়ালটাও — স্বয়ং-ই। সমগ্র শক্তির প্রকাশে তো।

তখন আবার ঋষিদের এই দিকটা, বৈষ্ণবের ঐ দিকটা বা শৈবের শাক্তের দিকটা সবই যেখানে প্রকাশ — সেখানে যে কোনও ধারা লইয়া স্বাধীনভাবে খেলা স্বাভাবিক হইতেই পারে, যদি কোনও একটা

লাইন — শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বা আর যে কোনও, শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধর, কি সেইখানেই থাকিয়া যাও, তবে গণ্ডিবদ্ধ ভাব রহিয়া গেল। চরম পরম বিকাশ প্রকাশ প্রয়োজন। চলিবার সময় তো লাইন ধরিয়া চলিতেই হইবে।

প্রঃ — সাধনা যদি অনন্তই হইল, তবে তো লক্ষ্যে কখনও পৌঁছান হইবে না?

মা — অনন্তে অন্ত, আর অন্তে অনন্ত তো। যে কোন স্থান হইতেই প্রকাশ হইতে পারে — সবখানেই সব কিনা। সমগ্রটা পাওয়া আয়ত্তাধীন না হইলে হইল না।

এক একটা দিকেও খেলিতে পারে সে ঐ স্থিতিতে। একটা আড়ষ্ট ভাবও দেখা যাইতে পারে উপলক্ষ্য হইয়া। উপলক্ষ্যটাও নিজেই — উপলক্ষ্য আর আসিবে কোথা হইতে? খেলা কিনা, বড় সুন্দর। হাসি খেলা যেমন, আড়ষ্টটাও তেমন, তাহার মধ্যেই, যাইবে আর কোথায়? এই আড়ষ্ট জাগতিক আড়ষ্ট নয় — আবরণ নিঃসংশয়, নির্দ্বন্দ্ব। আবার তাঁহাকেই — তিনি প্রণামও। কিন্তু এমন জায়গা আছে, যেমন কালাকে কালা বলিলে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে সহ্য করিতে পারে না, তেমন তাহাকে বলিলেও সহ্য করিতে পারে না — আড়ষ্ট হইয়া যায়। যাহা উপস্থিত বলা হইল, তাহা কিন্তু এ জাগতিক নয়, — এ জাগতিকও কিন্তু কতকটা দেখায়। যেমন কাহাকে বলিল, তুমি ভগবান — হয়তো শরীর ত্যাগ হইয়া যাক, এ ব্যবস্থার মত অবস্থা দেখা গেল। সব নিয়াই খেলা হইতে পারে, সবই তখন তাহার অধীন — নিজের অধীনে নিজে; একেতেই সেই দুই এর পূর্ণাঙ্গীন প্রকাশ, দুয়েতে সেই একই — এক দুয়ের আর প্রশ্নই বা কোথায়?

দেখিলাম আপনা হইতেই সেই রাত্রিতে শোওয়া আর হইল না, তিন দিন একেবারে নিরম্বু উপবাসে কাটিল। শরীর পূর্ণ সুস্থ। সেই সময় হইতেই আপনা আপনিই কথা বন্ধ হইল। এ কি রকম জানিস? স্থিতি পাওয়া। আবার আনন্দ নিরানন্দের উপর — আনন্দে ভরপুর। কেবল তাহাই নয় স্থিত হওয়া। তাহার পর সেই স্থিতিতে অখণ্ড স্থিত হওয়া। স্থিত হইলেই হইল না। তাহাতেই যে সব, তাহা আয়ত্তাধীন। তাহা লইয়া নিজে স্বাধীনভাবে খেলা আর কি। খেলা — যেখানে খেলা অখেলার প্রশ্ন নাই, যা তাই। তাই ত চাই।

এ শরীর সাধক সাজিয়াছিল। সাধনার খেলার পরিসমাপ্তিতে যখন নিজে কে? —তার পরিচয়টা প্রকাশ, তখন এই প্রকাশে জিজ্ঞাসা আসিল — কে? ক্রিয়া, কর্ম, কর্তা তিন যেখানে অভেদ-রূপে পূর্ণ প্রকাশ। ধর না, মেঘমুক্ত সূর্য আর কি।

অন্যান্য বাক্য প্রকাশে ঐ স্থিতি। সহজভাবেই প্রকাশ, উপস্থিত এইভাবে কথা হইবে না। তখন শান্ত, গম্ভীর, মৌন। এটা বাক-সংযমের মৌন ধারণ নয়। শুধু ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা মুখ দিয়া বাহির হওয়া না। ভগবৎ কথা আলোচনাও সাধারণ ভাবে না। সেবার প্রয়োজনে ভোলানাথের সহিত অস্ফুট যতটুকু ততটুকুই কথা হইত ত। পরে অন্তর্জগতের কথা, বহির্জগতের কথা, যাহা আলাদা আলাদা তোমাদের কাছে — তাহার গণ্ডিটা ক্রমে ক্রমে কুণ্ডলীভঙ্গে সহজ ব্যবহারে শরীর চলিত। নিত্য ক্রিয়াদি আর রহিল না। কেবল মৌন আর কোন কোন দিন কুণ্ডলী দিয়া কথা।

প্রঃ — ঐ প্রকাশের পর কুণ্ডলী, মৌন ইত্যাদি এই ক্রমটা আবার কিরূপ?

মা — ক্রমরূপে ধারা প্রকাশের জন্য। নিজেই নিজ ধারারূপে প্রকাশ করিয়া ধারার ক্রমের পরিপূর্ণতা প্রকাশ হইল। উপমা যদিও সর্বাঙ্গীন হয় না। ধর না, যুবরাজের রাজত্ব লাভের জন্য ক্রম শিক্ষা ক্রিয়াদি আবশ্যক।- রাজ্য প্রাপ্তিতে রাজার কাজ কর্ম — সে ত রাজার ক্রম ক্রিয়া নয়।

প্রঃ — ধারারও ত কত রকম ধারা আছে। সম্প্রদায়েরও ত কত রকম সম্প্রদায় আছে। তবে ধারা বলিতে কি বুঝিব?

মা — আরে! এ সব যে খাস তালুকের খাস মহালের ক্রিয়া। সব ধারা — সব যে ধরা। আবার শব ধরাটাও ত ইহাতে কি? মহামূল অখণ্ড রাজত্বে যে। আরে! তোমরা যাঁহাকে 'যিনি' বলিয়া মনে কর, এ যে তাঁহার রূপ (মা নিজের শরীরকে নির্দেশ করিলেন)। তুমিই ত — সর্বরূপেতে, তাই আলাদা আলাদা কর কেন? আরে বাবা! দুইভাবে কিন্তু দ্বন্দ্ব দুঃখ, মনে রাখিও। ভাব না কেন—জগতের গুরু যিনি, আমার গুরুও তিনি। আমার ইষ্ট যিনি, জগতের ইষ্টও তিনি। আমার গুরু ইষ্টতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরু, ইষ্ট। অনন্ত আকারে, অনন্ত প্রকারে, অনন্ত

ভাবেতে একমাত্র তিনি-ই। কোন ধারা বাদ যায় না যে ধারায় ঐ ধারা জানিও।

অবস্থা শোন—এটা কোন সাধকের শিক্ষা লাভ করিতে করিতে ক্রমোন্নতিতে যেখানে আবরণ নষ্ট, পরম স্থিতি—এই প্রকাশে আর ঐ উল্লিখিত ধারার প্রশ্ন আসে না। এই প্রকাশে সেই অখণ্ড প্রকাশ—বাহির ভিতর এক হইয়া স্থিতি, যা লক্ষণ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ গ্রন্থাদিতে আছে—শুদ্ধ, চিৎ ব্রহ্ম। এই ছোট্ট মেয়েটা এখানে ত তোমাদের এলোমেলো। এই দিকটা হইবে বলিয়াই খেয়ালে নিজেতেই নিজে ঢাকিয়া আবার ধারা। আরে! তাঁহাতেই সব কিনা, এইটাই মনে কর। তাহা হইলে ঐ ধারা আবার কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন আসিবে না। বুঝিবে, তবে ত মজিবে। তিনি মৌজী কিনা, তাঁহার মৌজ আর কি! অন্তে অনন্ত, অনন্তে অন্ত—ঐ যে যা-তা।

প্রঃ—তাঁহার মৌজ। মা! তুমি 'তাঁর-তাঁর' বল কেন? আমরা ত তাঁহাকে চিনি না; যাঁহাকে চিনি তাঁহার কাছে...

মা—তাঁহাকেই ত চিনিবার জন্য। মানে আপনাকে জানা। 'তাঁর-তাঁর' করা তোমাদের জন্যই জানিও।

ক্রমে তিন বৎসর অন্তে হস্ত-কুণ্ডলী বন্ধ হইয়া পায়ের দ্বারা কুণ্ডলী আরম্ভ হইল। পরে সর্বব্যাপক—সকলের মধ্যে চলন বলন সহজ।

প্রঃ—পরে কেন তবে আবার বাহ্য ভাবাদির প্রকাশ?

মা—বাঃ! তোমাদের মত শোওয়া, বসা, বলা, চলা, ফেরা, হাসি খেলার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর না? হ্যাঁ, একটা সময় গিয়াছে—এ জাতীয়টাও ছিল না। তবে জানিও এইটা যেমন, ঐটাও ঠিক তেমনই, এ শরীরের কাছে। তবে ঐ ভাবাদি কিন্তু অজ্ঞানের জীবত্বের মধ্যে আবেশ ভাবাদি নয়। ভাবের প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটাই জানিও ঐ খেলায়—যখন যাহা হইয়া যায়। বাবা! তুমিই ত আমি, আবার আমিও তুমিই। আবার দেখ—'আমি তুমি'র প্রশ্নই নাই। যে যা বল তাই, কোন গোলমাল নাই। কর্মেরও বাঁধন নাই, অকর্মেরও বাঁধন নাই। নিষ্কাম কর্ম, কর্ম-ত্যাগ,—এর কোন বাঁধন যেখানে নাই, নাইটাও নাই কিন্তু। তোমাদের এলোমেলো মেয়েটা আর কি!

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের শেষে মা আবার পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—এই সময় এই শরীরের একটা মহান সর্বাত্মক ভাব। নিজের খেয়ালেই আবার খেলা এবং তাহার পর অন্য ধারায় খেলাটা

আরম্ভ হইল। এ কথা বন্ধ—সাধারণ মৌনী থাকা নয়, বা বাক্ সংযম করা তাহাও নয়। কথা বন্ধ আপনিই হইয়া গেল, কাহারো সহিত কথা বলিবার ভাবই রহিল না। ঐ কেমন একটা প্রকাশের পর আপনা হইতেই বহির্জগতের বাক্যের সঙ্গে গভীরভাবে কথা বন্ধ রহিয়া গেল, ভিতরে যন্ত্রের মত নিরন্তর আপনা আপনি সে-ই চলিত — নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত। সাধারণতঃ যাহারা মৌন অবলম্বন করিবে, তাহাদের মন তাঁহাতেই থাকা। তাঁহাকে ছাড়া ক্ষণেকের জন্যও যদি থাকা হয়, তবে মৌন ভঙ্গ হইয়া যায়।

তিন দিনের পর যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন দেখা যাইত, প্রথম গ্রাস নিবার সময় কিছু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মিলাইয়া রাখা হইত এবং যেমন নিবেদন করা সেইরূপ হইত। পরে খাওয়া শেষে তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কয়েকদিন এইরূপ চলিয়াছিল।

প্রঃ—কাহার জন্য ?

মা বলিলেন—ঐ স্থিতিতে কাহার জন্য তোমরাই বাহির করিয়া লও। প্রথম তোমরা যখন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষা পাও, তখন যেমন অজানিতভাবে গুরুর আদেশমত সাধনা করিয়া যাও এবং সাধনা করিতে করিতে ক্রমোন্নতি। গুরু শিষ্য যেখানে প্রত্যক্ষ, ভিন্ন এবং অভিন্নরূপে স্বয়ং প্রকাশ, তাহার যতটুকু ক্রিয়া ততটুকু ত চাই। এখন স্থান বুঝিয়া বাহির কর।

মা আবার পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—পৌষ মাসের ১৩/১৪ তারিখের মধ্যেই ঐ রকমটা হয়। সেই হইতে প্রায় ৩ বৎসর কথা বন্ধ ছিল। সে সময় নিজের ভাবে থাকা হইত। তখন ভবিষ্যতের জাগতিক অনেক ঘটনার প্রকাশ, মন্ত্রাদির মত এই শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইত। কখনও কখনও ঐ সব বিষয়ে নিজেই প্রশ্ন করিতাম, নিজেই শুনিতাম।

বাসার বাহিরে যাওয়া আসা বিশেষ করা হইত না। আর কেহ স্পর্শ করিলে বিজলী গায়ে লাগিলে যেমন ধাক্কা লাগে, সেইরূপ শরীরে বোধ হইত। শরীর অবশ হইয়া বসিয়া পড়িত। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া পরে স্তোত্রের মত মন্ত্রাদি বাহির হইলে নেশার ভাবে উঠিয়া পড়া হইত। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত শরীরে ঐ ধাক্কার ভাবটা চলিত। সে সময় সকল মনুষ্য বা বস্তু ইত্যাদির ভিতর দিয়া ভাব অভাব যাহাই থাকুক না কেন, ২৪টি ঘণ্টার—একটা নিত্য আনন্দ

শরীরের ভাবে প্রকাশ থাকিত। হঠাৎ শরীরের কোন স্থানে ব্যথা পাইলে সে-ও যেন ঐ একই আনন্দ। বিচার আসিত—এইরূপ নির্লিপ্ত অবস্থায় সাধকের সঞ্চিত কর্মগুলি ক্ষয় হইয়া যায়। কর্ম সৃষ্টি হয় না। আবার কোন লৌকিক আনন্দ দেখা দিলে বিচারে আসিত ইহাও ত ভোগের সৃষ্টি করে। এই প্রকারে যে যত জাগতিক দিকে ভোগ করে, তাহার তত কর্ম বন্ধন বাড়িয়া যায়। সর্বক্ষণই এইরূপ বিচার চলিত ও এক খেয়ালে মহা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সময় বিশেষ আসনাদি, মূর্তি দর্শন ইতাদি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ভিতরে বাহিরে এক সত্বার আনন্দে আর কোন বিষয়েরই স্মৃতি—বিস্মৃতির দিক না।

ভোলানাথ এইসব অবস্থা ভালরূপে লক্ষ্য করিত, জিজ্ঞাসা করিত —এইসব অবস্থার শেষ পরিণতি কি ? এ শরীরের কিন্তু ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছু দর্পণে মুখচ্ছবির মত স্পষ্ট দেখিয়াও তাহার নিকট প্রকাশ করিবার খেয়ালটা হইত না।

একদিন কালীকচ্ছের মহেন্দ্র নন্দী বাজিতপুর আসিয়াছিলেন, এ শরীরের সম্বন্ধে নানা লোকের নানা কথা — মাথা খারাপ, ভূতের দৃষ্টি, দেবতার দৃষ্টি, হিষ্টিরিয়া এইসব কথা উঠিয়াছিল। ভোলানাথ আমাকে মহেন্দ্র নন্দীকে দেখাইল। তিনি ডাক্তার ও সাধু বলিয়া পরিচিত। তাহার সম্মুখে গিয়া হাত দুই দূরে বসিলাম। নিঃশব্দে অবগুণ্ঠন খুলিয়া বাহিরের লোকের নিকট বসা এই প্রথম। তিনি স্থির দৃষ্টিতে এ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ভোলানাথকে বলিলেন—ইহার ভাবগুলি খুব উচ্চ। আপনি অসুখ বা অন্য কোনরূপ বলিয়া চিন্তা করিবেন না। ইহার ভাবে কদাচ বাধা দিবেন না। (ইহা দীক্ষার খেলাটার কিছু পরের ঘটনা।)

মৌন হইবার পূর্বে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসই নানারূপে নানা ভাবে ঐ জপ, পূজা, যোগক্রিয়া, আসন ইত্যাদি হইতেছিল। যখন যে কোন ক্রিয়াদি একবার প্রকাশ হইয়া, পরিবর্তন হইয়া পূর্ব ক্রিয়া বা নিয়ম হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত তখনও কোন অভাব বোধ হইত না। অর্থাৎ ঐ জপ বা ঐ পূজা বা ঐ আসন ইত্যাদি কর্ম আর হইতেছে না, ইহাতে কোন সংশয়ের ভাব জাগিত না। ইহার কারণ এই যে — নিঃসংশয়ে স্ব-প্রকাশ কিনা। কিন্তু যখন সাধারণভাবে সাধকের সাধন চলে, তাহা দেহের কোন দেবতার ধ্যান, পূজা, জপ ইত্যাদি

যে কোন রকমে ক্রিয়াদি পূর্ণাঙ্গরূপে সমাপন হয় তখন সম্বন্ধীয় সংস্কার কাটিয়া চিত্ত নির্মল হয় বলিয়া সেই সেই বহু প্রকাশ হইতে পারে। যদি মন্ত্র চৈতন্য অর্থাৎ মন্ত্রের দেবতা, রূপ, গুণ বা তত্ত্ব ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হয়, জ্ঞানের উন্মেষ হয় তবে ভিন্নভাবে বাহ্য ক্রিয়াদির বিষয়ে সাধকের আর আকর্ষণ রূপটি খণ্ডভাবে থাকিতেই পারে না। যোগীরা যোগক্রিয়া করিতে করিতে যখন তাহারা একযোগে যোগাযুক্ত যে আছে তাহা প্রকাশিত হয় তখন তাহাদের যোগসহ মীমাংসা নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যায়। যাহারা জপ পূজা করে, উপাসনায় উৎকর্ষে যখন আপন আপন উপাস্য দেবশক্তির উন্মাদনায় আত্মহারা হয়, তখন কোন সময়ে তাহাদের বাহ্য অনুষ্ঠান দূরে সরিয়া পড়ে। আর যাহারা জ্ঞান বিচারে তাঁহার অনুসন্ধান তৎপর হয়, তাহারা যতই অগ্রসর হয়, বুদ্ধি বিচারের পরপারে যাইয়া আমি তুমির একত্ব উপলব্ধি করে।

কথা বন্ধ হইবার সাথে সাথে শারীরিক ক্রিয়াদিও ক্রমে ক্রমে সব বন্ধ হইয়া আসিল। গৃহ কর্মাদির পরও বেশ সময় পাওয়া যাইত। সে সময় সর্বক্ষণ আপনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের খেয়ালে থাকা হইত। তখন প্রথম উদ্ভূত মন্ত্রটি খেয়ালে থাকুক আর নাই থাকুক ভিতরে ভিতরে কণ্ঠে আলজিহ্বা ও গলায় লাগিয়া লাগিয়া টক্ টক্ করিয়া ঘড়ির আওয়াজের মত পরিষ্কার উচ্চারিত হইত। যখন এইরূপ হইতে লাগিল তখন শরীরটার এক খেয়াল হইল — ইহা কি? নিজ হইতেই বলা হইল ও কানে শোনা হইল — ঐ বীজটির ধ্বনি। সেইটি বেশ আপন কাজ করিয়া যাইত। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বহুবার করিয়া হইত। কখনও শ্বাসের পরিবর্তনের কোন ক্রিয়াদি হইত না। পরে যখন আপনিই এ জাতীয়টা কখনও অপ্রকাশ হইয়া গেল তখনও দেখা যাইত কি — এই জপটা যে হইতে ছিল সে-ও যা, এখন না-হওয়াও সেই একই গতি। বাহ্য ক্রিয়া অন্ত-ক্রিয়ার গতি একই ত। কিন্তু হঠাৎ তোমরা কেহ মহা ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া আসিতেছে, জগতের এ্যাক্সিডেন্ট জাতীয় কিছু লইয়া তখন আপনিই হঠাৎ করিয়া ক্ষণিক ঐ জপটি কণ্ঠে হইতে থাকিত। এ শরীরের কোন ব্যস্ততা দিবা রাত্রের মধ্যে কোনও সময়ই না, জানিও। ধর না, যেন ঐ অক্ষররূপে আড়াল দিয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া গেল, স্থিতি খণ্ডিত না হওয়া। পরে তাহাও ব্যস্। এইরূপে চলিয়াছিল।

সাধারণতঃ জীবের ভিতর দুইটি শক্তির খেলা হয়, ইচ্ছাশক্তি ও মহাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি স্বকীয় বাসনাকে লইয়া খেলিয়া থাকে, আর মহাশক্তি সকল সংকল্প বিকল্পের উপর দাঁড়াইয়া জীবের কর্ম-ভাবানুযায়ী তাহাকে চালিত করে। সাধন জগতে যখন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ক্রিয়াদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া মহাশক্তির আভাস পাওয়া যায়, তখন এক তত্ত্বের ভিতর এই যে জাগতিক নানাত্ব তাহা ডুবিতে থাকে। তখন এক চিন্তা, এক লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

একদিন ঊষাদিদির বাসায় গিয়া দেখি সে কি এক বই পড়িতেছে। ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলাম — কি বই? সে বলিল — মহাভারত। তুমি পড়িবে? সে এক খণ্ড হাতে দিল। তাহা লইয়া চলিয়া আসিলাম। পুস্তকাদি পড়া অভ্যাস ছিল না। সেই দিকে খেয়ালও যাইত না।

একবার ভোলানাথ একখানি বই দিয়াছিল, প্রথম ভোলানাথের বাড়ী যাওয়ার পরে। থামিয়া থামিয়া উহার কয়েক পাতা পড়া হইয়াছিল। এই কারণে এবং সরল ভাষাও বোধগম্য প্রকাশ নয় দেখিয়া ভোলানাথ আর বিশেষ কোন পুস্তক কিনিয়াও দেয় নাই, পড়ার কথাও বলে নাই। সেইদিন ঊষাদিদির নিকট হইতে মহাভারতখানি আনিয়া খুলিয়া পড়িতে বসিয়া দেখি — অক্ষরে দৃষ্টি পড়িল কণ্ঠের বীজমন্ত্রটি বন্ধ হইয়া যায়। আবার দেখি — যখন বীজ মন্ত্রটির দিকে খেয়াল যায় তখন অক্ষর দেখিলেও 'ঐগুলি কি' বোধ হয় না বা পড়া যায় না। অক্ষরে আবার চোখ পড়িলে শ্বাসও বন্ধ হইয়া আসিত। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতাম। পরে আবার অক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়িলে দেখা যাইত অক্ষরের চারিদিকে একটি জ্যোতি। তাহার পর অক্ষরটির পাশে আর একটি হালকা জ্যোতিচ্ছটা অক্ষর। পরে অক্ষরটিও সুন্দর শুভ্র জ্যোতির্ময়। মূর্তি দেখিলেও কখনও কখনও এইরূপ হইত — জ্যোতির্ময় প্রকাশ। এমনও হইত এক অক্ষরে দৃষ্টি পড়িলে অপর অক্ষর বে-খেয়াল হইয়া গায়েব হইয়া যাইত। কাজেই লাইন ধরিয়া আর পড়িয়া উঠিতে পারা যাইত না, বীজমন্ত্রটি আবার আপনা হইতেই চলিতে থাকিত। তাই পুস্তকখানি ফেরৎ দিলাম। বাস্তবিক যদি একবার স্বাভাবিক জপ আরম্ভ হয় — তাহা হইলে আর অন্য কিছু বলিবার, পড়িবার, শুনিবার বা দেখিবার অবসর থাকে না। লক্ষ্য

পড়িলে দেখা যাইত, খাইতে বসিয়া, চিবাইতে চিবাইতেও নাম চলিতেছে। হাতে কোন কাজ কর্ম করিতেছি, তখন চোখের দৃষ্টি অক্ষরের দিকে গেলেও নাম বন্ধ হইত না। খেয়াল থাক আর না থাক টক্ টক্ করিয়া নাম চলিত। ক্রমশঃ দেখা গেল, পড়িয়া থাকার অবস্থা (অর্থাৎ সমাধির অবস্থা) বাড়িতে লাগিল। সেই কারণে সকল সময় ঐ বীজটি আর হয় না। কোন্ সময় যে বন্ধ হইয়া যাইত খেয়ালও থাকিত না। পুনরায় খেয়াল করিতে গেলেও ঠিক ঠিক কখনও হইত না। পালাইয়া পালাইয়া যাইত। হঠাৎ আবার কোনও সময় আপনা হইতেই চলিতে থাকিত। ইহা দ্বারা বুঝিবে যদি এক সত্য লক্ষ্য করিয়া কেহ অগ্রসর হয় তবে পথের মধ্যে যাহার যাহার সংস্কার অনুযায়ী নানাবিধ ভাবের খেলা আসিয়া পড়িলেও প্রথমে লক্ষ্যটি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া দেখাইতে চলিতে থাকে।

কি যেন এক অভিনব ভাব প্রবলবেগে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সে ভাবটি স্থির হইয়া গেল। খেয়াল হইতে লাগিল ঐ বীজের খেয়ালটিও যেন মিলিয়া মিলিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে বুঝিবে সাধারণ ভাবে যাহারা সাধন আরম্ভ করে তাহাদেরই যে পর্যন্ত নিজের দেহাত্মবুদ্ধি ও নাম, রূপ, গুণ, ভাব, অভাবের গণ্ডিবদ্ধ সংস্কার ইত্যাদির দিক আছে, ততক্ষণ এই নাম ও রূপ আলাদা আলাদা রূপে। যে সংস্কার যখন দূরীভূত হইতে থাকিবে, তখন অজপা যোগে সেই মহাযোগে যাইতেই হইবে। অনেকটা আগুনে পতঙ্গ পড়িবার মত।

আরও একটা দিক শোন — পূর্বে কিন্তু কদাচিৎ শরীরের কোনরূপ ব্যস্ততা দেখা দিলে তখন ঐ বীজটি হঠাৎ কণ্ঠে উঠিয়া পড়িত, ক্ষণিক আপন কাজ করিয়া আপনা হইতেই আবার বন্ধ হইয়া যাইত এবং ব্যস্ততা শান্ত হইয়া যাইত।

কোনও সময় আবার ইহাও দেখা যাইত, তোমাদের দৃষ্টিতে সাময়িক জাগতিক কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বা তাহার আশঙ্কা হইলে একটি চক্র আসিয়া সামনে ঘুরিতে থাকিত। যে অখণ্ড ভাবধারাটা আছে, তাহার উপর কোন বাধা বিঘ্ন আসিবার আশঙ্কা হইলে তাহা ঐটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত। ঐ একটি ভাবের কাছে অন্য কোন ভাব দাঁড়াইতেই পারিত না। তখন পূজা প্রভৃতি দেখা বা বাহিরের

কোন তামাসা ইত্যাদি এই সবই আলাদাভাবে দেখা বা খাইয়া, পড়িয়া, শুইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোধ করা ইত্যাদি অন্য কোন বিষয়ই সেই ভাবের নিকট আলাদা ভাবে আর স্থান পাইত না। জগতের শোক, দুঃখ, ভয়, উহার ভিতর স্থান পায় না। একটি বিরাট, উদার শান্ত ভাব অবিচ্ছিন্নরূপে এমনভাবে চলিতে থাকিত যেন নিজেতেই নিজে জমিয়া আছে। শরীরটা দেখিতাম কলের পুতুলের মত গৃহের কর্মাদি নিখুঁতভাবে করিত। অতিথি সেবাও, কোন কথা বলি না বলিয়া অসুবিধা হইত না। দেখিতাম বসিয়া আছি, হঠাৎ শরীরটা উঠিয়া গেল। কোথায় যাইবে বা কি কাজ করিবে কিছুই ভাবিল না। কিন্তু হাত যথাস্থানে যাইয়া কাজ করিতে লাগিল। পরে দেখা গেল বাহিরের দিক দিয়া সে সময় সে কাজের দরকার ছিল। খেয়ালে আসিল — মন আর কোথায়? মনটা কি? — ভগবান হইতে আলাদা কিছু মানা — ইহাই ত মন। কি এক আনন্দের প্রকাশে নিজেতেই নিজে, আনন্দ-স্বরূপ স্বয়ংই। শরীরটা যাবতীয় কাজ কর্ম নিয়া হাসি কান্নার ভিতর এক ভাবেই খেলিতে থাকিত। নিজের আলাদা বুদ্ধি বিচার বা চেষ্টা করিয়া কোন কাজ করা সে সবের এখানে আর স্থান কোথায়?

শিশু যেমন আনন্দে নৃত্য করিবার সময় কিছুই দেখে না। কেমন করিয়া নাচিবে বা কোথায় পা ফেলিবে, ততটুকু সময়ের জন্য সে একেবারে আপন খেয়ালে তন্ময় থাকে। এই শরীরটাও যেন সর্বক্ষণ এক ভাবে খেলিত। এ উপমাও এখানে চলে না যেন। মানুষে দেখিত বুদ্ধি বিচার করিয়া কাজ কর্ম করিতেছে। কিন্তু এ শরীর যে কি করে আর কি ভাবে চলে তাহা কেমন করিয়া বুঝান যায়। বুঝাইবার ভাবও আর আসিতেও পারে না।

৫½ মাস ক্রিয়াদির পর সকল কার্যাদি শেষ করিয়া এ শরীরের আহারাদি করিতে করিতে প্রায়ই ভোর হইয়া যাইত। ইহার ভিতর কোনরূপ শারীরিক অসুখ বা ক্লান্তি ছিল না। তিন দিনের উপবাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন হইতে দ্বিপ্রহরে আহারের ব্যবস্থা আপনভাবেই হইয়া গেল।

ইহার ভিতর একদিন ক্ষেত্রপাল তাহার অসুস্থ ছেলেটিকে নিয়া আসিল। ছেলেমানুষ কোন কোন সময় কাহাকেও না বলিয়া হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত এবং জঙ্গলে, ছাড়া বাড়ীতে বা খালি

ঘরে যাইয়া পড়িয়া থাকিত। ক্ষেত্রবাবু অনেকরকম তাবিজ কবজ চিকিৎসা পূজাদি করাইয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল পায় নাই। শেষে হতাশ হইয়া তাহাকে এখানে আনিয়াছে। ছেলেটি আসিয়া দূর হইতে এ শরীরকে নমস্কার করিল এবং তাহার উপর অতি সামান্য সময়ের জন্য এ শরীরের দৃষ্টি পড়িল। সে পরে ভাল হইয়া গিয়াছিল।

মায়ের নামে শিব পূজা

এ শরীরের পিতা অবস্থাদি শুনিয়া একদিন দেখিতে আসি-লেন। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া এ শরীরের নমস্কারের খেয়াল একেবারেই আসিল না। ইহাতে তিনি অবাক হইলেন। ভোলানাথ এ শরীরের সব অবস্থাদি তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে পর তিনি বলিলেন — ইহার এইরূপ ভাবাদি পূর্বে জানিলে, ইহাকে সংস্কৃত পড়াইতাম।

ইহার ভিতর শিবরাত্রি আসিয়া পড়িল। তিনি ৪/৫-টি শিবপূজা করিলেন। এ শরীরের নামেও একটি শিব ছিল। বাবা যখন এ শরীরের নামে শিবপূজা আরম্ভ করেন যদিও আমাকে জানান নাই যে আমার নামে শিব পূজা করিতেছেন, তথাপি সেই সময় এ শরীরের মুখ হইতে নানা প্রকার সংস্কৃত মন্ত্র শ্লোকাদি বাহির হইতেছিল। তিনি এ সব শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন।

কুণ্ডলী দিয়া কথা বলার সূত্রপাত

একদিন ভোলানাথের ভাই যামিনী আসিবে খবর আসিল। আমি কথা বলি না। ভোলানাথ বলিলেন.— যামিনী বহুদিন পর আসিতেছে, তুমি কথা বল না। এ কেমন হইল? যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া নমস্কার করিতে চাহিলে আমি সরিয়া গেলাম। সে মহা দুঃখিত হইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বাহিরে চলিয়া গেল। পরে ঘরে ফিরিয়া দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিল — আমার সঙ্গেও কথা বলিলেন না। এ শরীর দাঁড়াইয়াছিল। মুখ হইতে মন্ত্র বাহির হইল, শরীরটা আসন করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে

থাকিয়া সেই আসনে একমুখী অবস্থায় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা — অনামিকার মধ্য-পর্ব স্পর্শ করিয়া বাম দিক হইতে ডান দিকে একশ্বাসে এক টানাভাবে মাটির উপর প্রথম একটি বৃত্তাকার রেখা পাতিলাম। সেই রেখার উপর আর একটি রেখা, তাহার উপর আর একটি রেখা দিয়া আসনটি বেষ্টন করিলাম। সেই সময় শরীরের উর্ধ্ব ভাগ নড়িলেও আসন স্থির ছিল। পরে ভিতর হইতে আসিল — ইহাকে "কুণ্ডলী" বলে। পূর্বে কুণ্ডলীর নামও শুনি নাই, কুণ্ডলী করিতে করিতেই মন্ত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। পরে অতি ধীরে ধীরে মুখ হইতে নির্গত হইল — কি কথা শুনিবেন, কি কথা বলিবেন, বলুন। এই প্রথম কুণ্ডলী দিয়া কথা বলা আরম্ভ হইল। কথা আপনা হইতে শেষ হইয়া যাইলে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে করিতে কুণ্ডলীটি তিনবার হাত দিয়া মুছিয়া পরে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতাম। ইহার পর হইতে কোন কোন সময় যখন অপরের সহিত কথা কহিবার হইত, তখন আপনা হইতে এইরূপ হইয়া যাইত। প্রশ্নাদি করিলেও, কথা বলিবার ভাব সকল সময় হইত না। কুচিৎ কখনো আপনা হইতেও ঐভাবে কথা বাহির হইত। কিন্তু ইহার কোন দিন সময় বা স্থান অস্থান নির্দিষ্ট ছিল না। ১৫/২০ দিন পরেও হইত, আবার ২/৩ মাসেও হইত না। কথা বলিতেছি শুনিলেই অনেকে ছুটিয়া আসিত। আসিতে আসিতেই হয়ত কথা বন্ধ হইয়া যাইত। যাহারা শুনিতে পাইত তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত। যাহারা শুনিতে পাইত না, তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় তিন বৎসর অর্থাৎ যতদিন কথা বন্ধ ছিল ততদিন চলিয়া-ছিল।

তিন বৎসরের মধ্যেই ঢাকা আসিয়াছিলাম, সকলের সহিত কথা বলিবার ভাব খুলিবার পূর্বে হইল কি, সাহবাগে একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আপনা হইতে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া হাতে কুণ্ডলী দেওয়ার মত ডান পায়ে কুণ্ডলী দিয়া কয়েকটি কথা অপরের সহিত বলিলাম। কথা শেষ হইলে পায়ের কুণ্ডলী মুছিয়া ফেলিলাম। এই জাতীয় আবার কুণ্ডলীর বহিঃপ্রকাশ নয়, অথচ কুণ্ডলী দিয়াই কথা বলা হইল। সাময়িক ভাবেই এইভাব ছিল।

ভোলানাথের অসুস্থতা

বাজিতপুরের কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন — কয়েকদিন হইতে ভোলানাথের শরীর ভাল নয়। প্রত্যহ রাত্রিতে কাছারি হইতে ফিরেন। একদিন বিকালে আসিয়া বলিল আজ শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছি। আমি রান্না বান্না শেষ করিয়া খাইতে ডাকিলাম। খাইতে বসিয়া বিশেষ কিছু খাইল না। আসিয়া শুইয়া পড়িল। আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ঘরে আসিলে বলিল — আমি পায়খানায় যাইব এই বলিয়া চৌকী হইতে নামিতেই দাঁড়ান অবস্থায়ই মাটিতে পড়িয়া গেল শ্বাস প্রশ্বাস নাই। শরীর অসাড়। আমি তখন কথা বলি না। কাহাকে ডাকাও হয় না।

ইহার ভিতরে আমার মুখ হইতে সংস্কৃত মন্ত্র শ্লোক ইত্যাদি কতগুলি উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় আমি যাইয়া ডান হাতে মাথায় ও সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলাম এবং হাঁটু গাড়িয়া তাহার মাথা আমার বাঁ হাতের উপর রাখিলাম। সে সময় দেখিলাম ভোলানাথের স্থূল শরীরের ভার একটি ছোট্ট শিশুর মতন। তখনো তাহার শ্বাস প্রশ্বাস নাই, শরীর কাষ্ঠবৎ। মন্ত্রাদি বলিতে বলিতে হঠাৎ মুখ হইতে একটি বড় শব্দ বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বাসার পরে এক বাসায় ঠাকুরভাই (মামাতো ভাই), জানকীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া খেলা করিতেছিলেন। তাহারা এ আওয়াজ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিল। আশ্চর্য এই যে, ভোলানাথের বাড়ীর পর যে বাড়ী, সেই বাড়ীর কেহ শব্দ শুনিয়া আসিল না, অথচ তাহার পরে অন্য এক জায়গায় বসিয়া জানকীবাবু ও মামাতো ভাই ও আরও কেহ কেহ বসিয়া খেলা করিতেছিল। এই খেলার মধ্যে তাহারা দুইজনই মাত্র এই আওয়াজ শুনিতে পাইল। ঐ শব্দের ভিতর এমনই ভাব ছিল, যাহাদের ডাকা, কেবল তাহারাই আসিল। তাহারা দেখিয়া নিজেদের ভিতর বলাবলি করিতে লাগিল — সংজ্ঞা ত নাই, শেষ সময়। ডাক্তার ডাকিয়া কি হইবে ? এইসব পরামর্শ চলিতেছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথ খুব ধীরে একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। একটু সুস্থ বোধ করিলে ধরিয়া পায়খানায় বসান হইল। আলকাতরার মত কালো বাহ্য হইল, অনেকেই এ শেষ অবস্থা ভাবিয়া চিন্তিত হইল। ভোলানাথকে সে রাত্রে আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে

দিলাম না, বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিলাম। সেবা যত্নে তাহার পরদিন হইতে ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠিল।

এ শরীরের মৌনাবস্থার সময় দেখা যাইত, যে যাহারা কোনও ছল চাতুরী বা অন্যায় করিত, তাহাদের উপর প্রখর দৃষ্টি পড়িলে তাহারা শোধরাইয়া যাইত। আবার যাহারা সরল, সত্যনিষ্ঠ ছিল, তাহাদের উপর ভাব-মধুর দৃষ্টি পড়িত। ইহাতে তাহারা খুব উৎসাহিত হইত। ক্ষণিকের জন্যই কখনও কখনও উক্ত ভাবাদি হইত। এই যে দুইভাবের দৃষ্টি, ইহা আপনা আপনিই চোখের ভঙ্গি ইত্যাদিতে গড়িয়া উঠিত। বাহির ভিতর, ভাব অভাবের, যোগ বিয়োগের কোনই সংশ্রব নাই, সব সময়েই একই — শান্ত।

উষাদির "মাতৃ" সম্ভাষণ

উষাদি ঘরের কাজকর্ম ফেলিয়া এ শরীরের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু এখানে কোন কথা বাহির হইত না। একদিন সে আসিলে কুণ্ডলী দিয়া আসন করিয়া তাহার সহিত এ সম্বন্ধীয় অনেক ভাল কথা হইল। তাহাতে সে খুব আনন্দ পাইল। আর একদিন তাহার সহিত কথাবার্তা চলিতেছে — হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল তোমাকে দেখিলেই দেবী বলিয়া মনে হয়। দিদি না বলিয়া 'মা' বলিতে ইচ্ছা হয়। বলিলাম — বেশ ত, তাহাই হউক। আমি দেখিতেছি কি জান, একা তুমি কেন, জগতের লোক এ শরীরকে মা ডাকিবে। পরে দেখি কি, সে আর এ শরীরের নিকট আসে না। বহু সময় কাটিয়া গেলে আমি নিজেই একদিন তাহার ঘরে গেলাম। পূর্ব হইতেই এ শরীরের হাবভাব ইঙ্গিতাদি সে অনেকটা আন্দাজে বুঝিতে পারিত। তাই দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল — তোমার ওখানে যাই না বলিয়া বোধ হয় খোঁজ করিতে আসিয়াছ। কি করিব তোমার নিকট গেলে খুব আনন্দ পাই। সর্বদা যাইতেও ইচ্ছা হয়, তবে দেখি কি, তোমার সঙ্গ পাইলে, তোমার উপদেশপূর্ণ কথা শুনিলে উদাসভাবে আমি যেন কেমন হইয়া যাই। আমি ছেলে পিলে, লইয়া আছি, আমার এই রকম উদাসভাব হইলে ত চলিবে না। আমি সংসারী লোক, তাই জোর করিয়া তোমার নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করিয়াছি। ইঙ্গিতাদির দ্বারা

তাহাকে বুঝাইলাম — তোমার কোন ভয় নাই। সব ঠিক থাকিবে। তুমি যাইও। তাহার পর হইতে সে আবার যাইতে আরম্ভ করিল।

বিদ্রূপের পরিণাম

একদিন এক বৃদ্ধা আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে একটু ঠাট্টার ছলে বলিতে লাগিল — একে ত ব্রাহ্মণ, এখন ত দেবতার উপর দেবতা। এ কথা কানে যাইতেই একটি প্রখর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, সে আমার দিকে চাহিয়াই জড়বৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তন্মুহূর্তে আমার হাসি আসিয়া পড়িতেই সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল — আমার কোন অপরাধ নিবেন না। তখন হইতে সে এ শরীরের সহিত খুব মাখামাখি করিত।

অসীমের আভাসে সীমার বন্ধন ক্ষয়

আমরা যে ঘরে থাকিতাম তাহারই এক কোণে একটি পর্দার আড়ালে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়াছিলাম। প্রথম হইতে সেইখানে বসিয়াই ক্রিয়াদি করিতাম। যখন কণ্ঠে জপ ভিন্ন অন্য অন্য ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, তখনো আমি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সেখানে বসিতাম। কিছুক্ষণ বসিলে চোখ বুজিয়া যাইত। সেই আসনস্থিত অবস্থায়ই মহা আনন্দ ও ঐ স্থিতি। কেমন একটা ভাবে সামনের দিকে মাথাটি মাটিতে পড়িয়া থাকিত — অচল, অটল। ভ্রূমধ্য হইতে একটি স্পর্শ অনুভব হইত আবার তথায় আকাশের মতও দেখা যাইত, উহাতে নানা রকমের রংয়ের আভা. একটির পর একটি গাঢ়ভাবে প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ হালকা হইয়া মিলাইয়া যাইত। একটি চক্ষু বন্ধ ভাবেই প্রকাশ। উক্ত অবস্থার ভিতরই পাড়ার মাত্র চারটি বাড়ীতে এ শরীর যাওয়া আসা করিত, অন্য কাহাকেও ছোঁওয়াও হইত না।

দূরবর্তী অন্য আর এক বাড়ীতে একটি মেয়ের বিবাহ হইবে। ভোলানাথ সে বাড়ীতে যাইবার জন্য বলিল। তাহাকে বলিলাম যে অমুক তারিখের পর সেখানে যাইতে পারি। কিন্তু বিবাহের দিন তাহার পূর্বেই ছিল। ভোলানাথ বলিল তাহা হইলে তোমার যাওয়া হইবে না দেখা যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হইয়া গেল যে বিবাহের দিন পিছাইয়া গেল।

শুভ বিবাহের পরদিন লোকাচারানুযায়ী সকলের সঙ্গে মিশিয়া মেয়েদের কপালে সিন্দুর দিলাম। তাহাতে বিদ্যুতের ধাক্কার মত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। ঢল ঢল ভাবের সহিত বসিয়া পড়িলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হই। ইহার পূর্বে রাতদিন এমন ছিল বেশীক্ষণ কাহাকেও ছুঁইয়া থাকিতে পারিতাম না। শরীর যেন আপনা হইতে সরিয়া আসিত। ইহার অনেকদিন পরে দেখিলাম মাটি স্পর্শ করা এবং অন্য কোন লোকজন স্পর্শ করা, এক সমানই বোধ হইত। অসীমকে পাইতে হইলে প্রথমে সীমার ভিতর আপনাকে বদ্ধ রাখিয়া চলিতে হয়। অনন্তের ও অসীমের আভাস আসিলে আস্তে আস্তে আপনা হইতে সীমার বন্ধন খুলিয়া যায়।

বিদ্যাকূটে মা

ইহার ভিতর একবার বিদ্যাকূট যাই। শরীরের এ অবস্থা শুনিয়া গ্রামের অনেকে দেখা করিতে আসিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল — ভগবানকে কি করিয়া পাওয়া যায়। বলিলাম — ব্যাকুল হইলে ভগবানকে পাওয়া যায়। আর একজন প্রশ্ন করিল — কি করিয়া স্থির হওয়া যায়। বলিলাম — স্থিরতার জন্য অস্থির হওয়া আবশ্যক। এক পণ্ডিত মহাশয় ধর্মালোচনা করিয়া এবং অন্যান্য অনেকে তাহাদের প্রশ্নের উত্তরাদি পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল।

এ শরীরের বোন সুরবালা ও হেমি ঐখানে ছিল। সুরবালার শরীর অনেকদিন হইতে অসুস্থ। বিদ্যাকূটে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল। শরীরের মা তাহাকে বলিল — তোর দিদিকে ভাল করিয়া প্রণাম কর। আর বল, যেন ব্যারাম সারিয়া যায়। কিন্তু সে কিছুতেই এই কথা বলিতে পারিল না।

একদিন আসনে বসিয়াছি, সুরবালাকে মা জোর করিয়া আনিয়া এ শরীরকে প্রণাম করিতে বলিল, সে নমস্কার করিতে আসিয়া, উপুড় হইয়া যে পড়িল আর উঠে না। ইহা দেখিয়া হেমি মাকে ডাকিয়া বলিল, দিদি উঠিতেছে না। মা ধরিয়া দেখে সুরবালা

সংজ্ঞাহীনের মত হইয়া আছে। মা বলিলে এ শরীর তাহাকে ধরিয়া তুলিল। সুরবালা বলিল — আমি এতক্ষণ কোথায় যে ছিলাম মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। তখন মা ভাবিলেন তাহার অসুখ সারিবে না। এ শরীরও তাহাই ইঙ্গিত করিল।

সুরবালা আর বেশী দিন নাই, ইহা ত জানিতাম, সেই খেয়ালে এ শরীরের একটা কান্না কান্না ভাব ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পাইল। পরে বিচারে আসিল — এইসব ত তাঁহার খেলা। শরীরবোধ জনিত দুঃখ মাত্র। দেখিলাম কান্নার ভাবটা যেন বাতাসে মাথার চুল উড়াইবার মত বাহিরেই প্রকাশ পাইতেছিল। ক্ষণিক জাগতিক হিসাবে মানুষের মনের ভিতর বন্ধনের ভাবগ্রন্থিতে সংস্কারগুলি আটকান থাকে এবং সময়োচিত শরীর নিয়াও খেলা করে। ঘাম বাহির হইলে যেইরূপ শরীর ক্ষণিক ঠাণ্ডা বোধ হয়, তদ্রূপ অশ্রুপাত, হাসি ইত্যাদির দ্বারা ভাবগ্রন্থি শিথিল হইলে ভগবানের জন্য প্রকৃত কান্না বা প্রকৃত হাসি বাহির হয়। জড়তার দরুণ এ সব গ্রন্থির কাজ সাধারণের উপর থামিয়া থামিয়া হয়। তাই তাহাদের কান্না বা হাসি বেশীক্ষণ চলিতে পারে না এবং বন্ধনভাবও সহজে কাটে না।

সাধনার একমুখী অবস্থায় হাসি বা কান্নার কোন কারণ আসা মাত্রই প্রবল বেগে সাধককে অভিভূত করিয়া আবশ্যকীয় সময় চলিয়া ভাবগ্রন্থি খুলিয়া দেয়। যাহাদের উচ্চাবস্থা তাহাদের সকল গ্রন্থি খোলা থাকে। হাসিকান্না একই ভাবে তাহাদের শরীর দিয়া অস্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পাইতে পারে এবং কখনো কখনো রৌদ্র ও বৃষ্টির মত যুগপৎ খেলিয়া যায়। এ শরীরে সকলের জন্যই হাসি বা কান্নার ধারা একই সমান।

একদিন মায়ের খুব জ্বর হয়। বাক্‌বন্ধ অবস্থায় ১২/১৩ দিন যাবৎ তাহাদের সংসারের সব কাজ কর্ম এ শরীরকেই করিতে হয়। মা'র অবস্থা খারাপ দেখিয়া এ শরীরের পিতা একদিন বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন, এ শরীরটা তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া মা'র নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মা সেইদিন হইতে ভাল হইতে লাগিলেন।

বাবা ভোলানাথ, মা ও সরণী